বাংলার

দেবদেবী ও পূজাপার্বণ

পৌরাণিক উৎস ও লোকভাবনা

দেবাশিস ভৌমিক

পুনশ্চ

॥ ভূমিকা ॥

প্রিয় পাঠক, এই বাংলার জলঙ্গী নদীর তীরে মফস্‌সলের একটি অখ্যাত পাড়ায় আমার বাস। শৈশব কৈশোরের দামাল দিনগুলির সঙ্গে আজও জড়িয়ে রয়েছে নানা কাটা ছেঁড়া স্মৃতির অবশেষ। নদীর পাড়েই ছিল কুমোরপাড়া। ঘাটে যাবার পথে কুমোরেরা ঠাকুর গড়বার যতরকম কৌশল প্রয়োগ করতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা লক্ষ করে তারপর ধাঁ করে নদীতে ঝাঁপ। কী করে খড় বাঁধা থেকে শুরু করে চোখ দেওয়া হয়, একমেটে থেকে প্রতিমাকে ডাক ও বুলেনের সাজে রানির মতো করে তোলা হয়, তা প্রতি বছর দেখতে দেখতেই আমার বড়ো হয়ে ওঠা। সেই অবুঝ শৈশবে বারবার মনে হত, কেন দেবীর ঠিক এইরকমই রূপ দেওয়া হয়, কেনই বা তার বাহন এটিই, এই দেবী সত্যিই আমাদের প্রতি স্নেহশীলা তো—এইসব হাজারো প্রশ্ন ভাবতে ভাবতে কখন যেন বড়োদের মতো হয়ে গেলাম। কিন্তু ছোট্টবেলার সেইসব উত্তর না পাওয়া প্রশ্নগুলোর অংশবিশেষ আজও মাথার মধ্যে জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়। কতকটা সেই শৈশবাশ্রিত তাগিদ থেকেই এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা। আর তাছাড়া আমার আর-একটি উদ্দেশ্য, পুরাণের বিচিত্র গল্পগুলি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করা।

বইটির মলাট নাম 'বাংলার দেবদেবী ও পূজাপার্বণ : পৌরাণিক উৎস ও লোকভাবনা' দেখে অনেকেই ভ্রূযুগল কুঁচকে ভাববেন যে দেবদেবী তো হিন্দুদের একচেটিয়া সম্পত্তি, সেটা আবার বাঙালিদের কায়েমি স্বত্ত্ব হয়ে উঠল কবে থেকে। কথাটা ঠিক। কিন্তু পাশাপাশি আর-একটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনের ব্যাপারে, পছন্দের পরীক্ষাগারে বাঙালি জাতি কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক, সাবধানী ও স্পর্শকাতর। ভারতের অন্যরাজ্যের বাসিন্দাদের মতো তাই বাঙালি তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই ঘরে এনে তোলেন নি, বাছাই বাছাই দেবদেবীদের জন্যেই তাঁর মধ্যবিত্ত ভাড়াবাড়ির এককোণে সিঁদুর মাখানো পিঁড়িতে পরিবারের সদস্য করে দেবী কিংবা দেবতার নিত্যপূজা দিয়ে থাকেন। স্বল্প সামর্থ্যের আয়োজনে শ্রদ্ধার ঘাট্‌তি থাকে না এক কণাও। বৎসরান্তে একবার পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি পাঠিয়ে সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে নেন যত্নের সঙ্গে। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের ঘরের এককোণে

একটি লক্ষ্মীর পট কিংবা গাছকৌটো থাকবেই থাকবে। পরিবারের আর্থিক সুস্থিতি ধরে রাখবার জন্যে মেয়ে-বউদের কাছে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা মানেই একটি শ্রদ্ধার আম্রপল্লব, একটি ছোট্ট থালায় সযত্ন নৈবেদ্যের বাতাসা; আর কণ্ঠে পাঁচালি সুরেলা গানের মর্মী সুরেলা উচ্চারণ—"দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ,/মন্দে মন্দে বহিতেছে মলয় বাতাস"। শীতের মাঝামাঝি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর কাছে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা—"আমার সন্তানকে মানুষ কোরো মা"। মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি মানেই সকাল থেকে উপোষ, কাঁচা হলুদ মেখে স্নান, ধুনোর গন্ধ, বছরের প্রথম কুল আর—"সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে"। সবকটি পুজোর উল্লেখ না করেও বলা যায় বাঙালি জাতি আর্থিক নিরাপত্তার জন্য যেমন লক্ষ্মীর ঘট পেতে থাকেন, তেমনি বিদ্যার্জনের জন্য করেন সরস্বতীর আরাধনা। একটি জাতি যে কেবল অর্থকেই জীবনের পরম মোক্ষ বলে মনে করে না, সরস্বতী পুজোর এত জনপ্রিয়তাই তার অন্যতম কারণ। শিক্ষা সংস্কৃতি রুচি ইত্যাদির প্রতি বাঙালি জাতির এই উন্নাসিকতাই তাঁকে অন্য জাতির তুলনায় মহান করে তুলেছে সে কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রতিটি দেবদেবী বা পালাপার্বনের শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে এসেছে বারবার।

তেত্রিশকোটি দেবদেবী কথাটা খুব প্রচলিত কথা। এখানে কোটি শব্দটি নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। কেউ বলে কোটি বলতে বর্গ বোঝায়। কেউ আবার এর সংখ্যাগত তাৎপর্যকেই বড়ো করে তুলে ধরতে চান। সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বাঙালি জাতি যে সব দেবদেবীকে তাঁদের আরাধ্য করে তুলেছেন, তার পেছনে রয়েছে তাঁদের সুনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী, তা ব্যাখ্যা করবার অপরিহার্যতা এ গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য একটি বিষয়। সবচাইতে বড়ো কথা হল, এই সব দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাসটি ঠিক কী, তা জানানোটাই এ গ্রন্থের আর-একটি আবশ্যিক প্রতিপাদ্য। সারা ভারতবর্ষ একজন দেবী ও দেবতাকে যে পৌরাণিক ধারাবাহিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন সেই একই ব্যাখ্যা বাঙালিদের কাছে সবটুকু ব্যাখ্যা নয়। কৃষিনির্ভর বঙ্গদেশে বঙ্গবাসী জীবনের পরমধন হিসেবে চিরকালই শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন কৃষিজাত উৎপাদনকে। কৃষির সঙ্গে দেবতা ও দেবীর যে একটা সুগভীর অন্বয় রয়েছে, একথা বাঙালিদের মতো করে আর কোনো জাতি ভাবতে চাননি। ফলে ঐশ্বর্যময়ী দুর্গা তাঁদের কাছে হাজির হয়েছেন শাকম্ভরী রূপ নিয়ে। গম্ভীরার দল শিবের কাছে জানিয়েছেন তাঁদের দৈনন্দিন ঋস্ত জীবনের গল্প। কৈলাসের নির্জনে ধ্যানরত শিবের রূপ নিয়ে বাঙালির ততটা মাথাব্যথা নেই। মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা—এঁদের সঙ্গে গ্রামবাংলার পারিবারিক সম্পর্ক। মা-মাসির কাছে পরিবারের ছোট্ট মেয়েটি যেমন আঁচল ধরে আবদার করে, ঠিক একই ভঙ্গিতেই বাংলার মেয়ে

বউরা মনসার থানে পুজো দেয়। ষষ্ঠীপুজো করেন বাড়িতে, নতুন শিশু যখন অতিথির মতো এসে হাজির হয়। শীতলার কাছে কাতর মিনতি জানান পরিবারকে সুস্থ সবল রাখবার জন্য। প্রতিটি আকুতিই অকপট। মাতৃত্বের কারুণ্যে সিক্ত। সন্তানের অনিষ্ট আশঙ্কায় কম্পমান হৃদয়ের স্পন্দন বাজে তাদের বুকের শ্বাসপ্রশ্বাসে। দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা—এঁদের কৌলীন্য যেমন বাঙালিদের কাছে প্রণম্য, তেমন যে সব দেবদেবীর সে কৌলীন্য নেই তাঁরাও বাঙালি জাতির কাছে একই সম্মানে পূজিত হন। আড়ম্বর ও আয়োজনে তফাৎ থাকলেও শ্রদ্ধা, ভক্তি, আন্তরিকতায় বাঙালি যে বিভেদরেখা টানতে পারেন না, এ গ্রন্থে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মূর্তিপূজায় বাঙালিদের বিশেষ অভিরুচির কথা তো বললামই। কিন্তু মূর্তি ছাড়াও বাঙালি তাঁদের পূজা অর্চনার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন আরও অজস্র পালনীয়-উৎসবকে। সেখানে মাটি বা পাথরের মূর্তি থাকাটা জরুরি কিছু নয়। প্রকৃতি কিংবা গাছগাছালি নিয়েই বাঙালিদের ভক্তিশ্রদ্ধার নানা নজির খুঁজে পাওয়া যায়, তার বিবরণ এ গ্রন্থে মিলবে। কিন্তু যেটা খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে যে, এইসব পূজা আর্চার বেশিরভাগটাই প্রমীলামহলের করায়ত্ত। সেখানে পুরুষের আগ্রহ কম। এটা সবাই না মানলেও কথাটা আংশিকভাবে সত্যি। মেয়েরাই নানাভাবে পূজাআর্চাকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার সহচর করে রেখেছেন যুগের পর যুগ। ফলে পরিবারের মঙ্গল, স্বামীর সমৃদ্ধি, সন্তানের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে নারী নানা কৃচ্ছ্রতাকে বরণ করে নিয়েছেন হাসিমুখে। সে সব কৃচ্ছ্রতাকেই আমরা ব্রত-ষষ্ঠী বলে জানি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিজের আর্থিক নিরাপত্তা কিংবা অন্নসংস্থানকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন এইসব ব্রত-ষষ্ঠীর নিয়মকানুন তৈরির মধ্যে দিয়ে। সে অন্য কথা। কিন্তু বাঙালি রমণীও তার একান্ত গোপন ইচ্ছে , তাঁর ভালোলাগা-ভালোবাসা, তাঁর পরকাল বিষয়ক কামনাবাসনা ইত্যাদি হাজারো বিষয় যুক্ত রয়েছে এইসব ব্রত-ষষ্ঠীর মধ্যে। বাঙালির একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসে আজও জায়গা পায়নি বঙ্গরমণীর এই নির্জন বাসনার ইতিবৃত্ত। তাকে কিছুটা তুলে আনবার চেষ্টা করেছি 'বাংলার দেবদেবী ও পূজাপার্বণ : পৌরাণিক উৎস ও লোকভাবনা' গ্রন্থে।

ভ্রমণ প্রিয় বাঙালি সবচাইতে বেশি বেড়াতে যায় ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার ধর্মস্থানগুলিতে। বাড়িতে কোনো অতিথি পায়ের ধুলো দিলে আমরা প্রথমেই তাঁকে নিয়ে যাই স্থানীয় কোনো মন্দিরের চৌহদ্দিতে। এতে অতিথি যেমন খুশি হন তেমনি গৃহকর্তাও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে কোনো অতিথি কলকাতায় এলে গৃহকর্তার তত্ত্বাবধানে তিনি অন্তত একবার হলেও কালীঘাটে মায়ের দর্শনটি সেরে আসবেন। হাতে সময় থাকলে দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ কিংবা বেলুড় ঘুরে

যাবেন না, এমনটা হতেহ পারে না। কাজেই ভ্রমণের সঙ্গে বাঙালির ভক্তিভাব একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার একদল বাঙালি যখন নিজের রাজ্যের মধ্যেই কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যান, তখন গৃহকর্তার কাছে তাঁর আবদারই থাকে স্থানীয় মন্দিরে একটু পুজো দিয়ে আসবার। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোন্ মন্দির আছে, তার সবটা হয়তো তুলে ধরতে পারিনি; কিন্তু উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলোর কথা, দেবদেবীর কথা তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। উদ্দেশ্য শুধু একটাই যে, ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির আনন্দের সহচর হয়ে উঠুক এইসব দেবদেবী ও পুজোআর্চা। আর-একটি কথা। পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক মন্দির বা দেবদেবীর পুজো ছিল যা অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হত বছরের পর বছর। কিন্তু ক্রমশ তা লুপ্ত হতে বসেছে। মূর্তিপুজার চল হয়তো এসব ক্ষেত্রে ছিল না। কোথাও মাঠের মধ্যে একটি পাথরের টুকরোকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করা হচ্ছে, কোথাও একটি গাছকে পুজো করা হচ্ছে। এইসব আঞ্চলিক দেবদেবীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন বাঙালিদের জীবনযাপন থেকে। দু'একটি পুজো-পার্বণ বাদ দিলে বেশির ভাগটাই আমাদের স্মৃতির অন্ধকার কক্ষে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। সেইসব মন্দির, দেবদেবী ও পুজোআর্চার কথা যতটা পেরেছি তুলে এনেছি এ গ্রন্থের দু'মলাটের মধ্যে। সবার শুভচিন্তায় যদি এসব দেবদেবীর পুজোআর্চা ও পালপার্বণ আবার স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে তবে এ গ্রন্থ প্রণয়নের সার্থকতা ভিন্ন মাত্রা পাবে।

পুজোআর্চার কথা না হয় বললাম। কিন্তু বাঙালি গোটা বছর জুড়ে মেতে থাকেন ছোটোবড়ো নানা ধরনের পালপার্বণ নিয়ে। সেসব পালপার্বণের কেন্দ্রে যে সবসময় দেবদেবী থাকবেন এমনটা না'ও হতে পারে। বাংলার গ্রামেগঞ্জে তৈরি হওয়া নানা কিংবদন্তীও এর উৎস হতে পারে। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে যেসব আঞ্চলিক উৎসব হয়ে থাকে তার কেন্দ্রে দেবতার মূর্তি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কতকটা বর্ধমানের অংশবিশেষে মূর্তিপূজা ছাড়াই নানা ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন বাঙালিরা। ভাদু উৎসব, টুসু উৎসব, ইঁদ পার্বণ, ধর্মপুজো ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিতে সেভাবে মূর্তিপূজা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাস উৎসব কিংবা বারোদোল-এর মতো আঞ্চলিক পার্বণগুলির ক্ষেত্রে দেবদেবীদের মূর্তি সামনে চলে আসে। গোটা বাংলা জুড়ে এইরকম অসংখ্য পার্বণ চালু রয়েছে। সবগুলির কথা উল্লেখ করা না গেলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির কথা এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। এসব আঞ্চলিক পার্বণকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রদ্ধালু মানুষ এসে হাজির হন পুণ্যলাভের আশায়। সুযোগ মতো সেরে নেন সামাজিক সম্পর্ককে একবার ঝালিয়ে নেওয়া। নানা জেলার মধ্যে সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান তাঁদের আয়ু

শক্তিকেই বাড়ায় তাই নয়, জীবনযাপনের একঘেয়েমি কেটে নতুন প্রাণের বায়ু যুক্ত হয় পুরোনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে।

আবার এমন কিছু কিছু পালপার্বণ বাঙালি আজও বুক দিয়ে আগলে রেখেছে যার কেন্দ্রে তেমনভাবে দেবতাকুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। এইসব পালপার্বণকে কেন্দ্র করে বাংলার মানুষ আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতে যান। পারিবারিক সম্পর্ককে ক্লেদমুক্ত করে তোলবার জন্য, এই ধরণের অনুষ্ঠান বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। যেমন জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা ইত্যাদি। হালখাতা, রথযাত্রা, অম্বুবাচী, মহালয়া ও তর্পণ, জন্মাষ্টমী, রাখিবন্ধন ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গায়ে লাগিয়ে দেয় সাতরঙা রামধনুর রং। এমনকী যাঁরা আমাদের ছেড়ে সজ্ঞানে চলে গেছেন পরলোকে, তাঁদেরও আমরা অনাত্মীয় বলে ভাবতে পারি না। গীতার সেই মহান বাণী—আত্মা জীর্ণবস্ত্রের মতো একটি শরীর পরিত্যাগ করে ভিন্ন একটি শরীরে আশ্রয় নেয়। আত্মার মৃত্যু নেই। সেই ঐতিহ্যানুযায়ী ভাবনায় জারিত হয়েই বাঙালি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে। দেওয়ালির সন্ধ্যায় বাজি পটকা ফাটিয়ে, ছাদের কার্নিসে মোমের আলো সাজিয়ে, আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে পরলোকগত পিতৃপুরুষের প্রত্যাবর্তন-পথকে আলোকিত করে তোলার মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির শ্রদ্ধাভক্তির একটি বিশেষ দিক ফুটে ওঠে। বর্তমান গ্রন্থে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। রংদোল বা দোলযাত্রা উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে বাস্তব জগত ও মায়াজগতের মধ্যে যে দার্শনিক বিভাজন রয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছি। দশহরা বা মকরস্নানের মধ্যে দিয়ে বাঙালি যে সত্যিই অমৃতকুম্ভের সন্ধান পেতে পারেন, তার নানা দিকনির্দেশও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়েছে। পৌষপার্বণ বা চড়কগাজন আজও গ্রামবাংলার এমন দু'টি প্রতীকী পার্বণ যা দিয়ে বিশ্বের কাছে আমাদের পরিচয় উজ্জ্বল করে তোলা যেতে পারে। আমরা বঙ্গবাসী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

এই বইটি পাঠকের কাছে তুলে দেবার আগে জানিয়ে রাখি, কোনো ধরনের পন্ডিতি দেখানোর জন্যে আমার এ বই লেখা নয়। সে যোগ্যতাও আমার নেই। শৈশব থেকেই মায়ের মুখে পুরাণের নানা ছোটো ছোটো গল্প শুনে আমার বড়ো হয়ে ওঠা। বয়স যত বাড়তে থেকেছে পুরাণের প্রতি, লোকসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থেকেছে ততই। আমার সেই ভালোলাগাটুকু ভাগ করে নিতে চেয়েছি মাত্র পাঠকদের সঙ্গে। তাই উত্তমপুরুষেই নিজের উপলব্ধি বিনিময়ের লোভটুকু ছাড়তে পারিনি। আমি পুরাতাত্ত্বিক কিংবা নৃতত্ত্ববিদ্ নই। সংস্কৃতিবিজ্ঞানী হবার কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এমন একটি সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থ লিখতে গিয়ে আমার সংকোচের অন্ত নেই। লেখকের অনেক ধরনের অপূর্ণতা পাঠকদের তৃপ্তির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে

পারে হয়তো। উপস্থাপন কৌশল নিয়েও নানা সমালোচনা হতে পারে। সবটুকুই বিনত মস্তকে শিরোধার্য করে নেব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর এত সবকিছুর মধ্যে দিয়েও যদি পাঠকবন্ধুরা এই বই থেকে তাঁদের যাপিত জীবন নির্মাণের সাংস্কৃতিক কৌতূহল নিবৃতির নির্যাস বিন্দুমাত্র হৃদয়পাত্রে সঞ্চিত করে রাখেন, তাহলেই আমি যথেষ্ট সন্তোষ বোধ করব। পুরাণের জটিল ঘটনাক্রমকে যতটা সম্ভব সহজ করবার একটা চেষ্টা করেছি এখানে। লোকজীবনের সঙ্গে দেবদেবীদের সম্পর্কের জায়গাটাকে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে আলো ফেলবার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস নিয়েছি এ গ্রন্থে। আর এ-সব আমার নিজের লেখা বই প্রসঙ্গে লেখকের সাফাই দেবার কথা। আসল মূল্যায়নের ভার সর্বস্তরের পাঠকদের ওপর ছেড়ে রাখার ভরসা আমার আছে। তাঁদের সমালোচনা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা কোনোটিই আমার কাছে ন্যূনতম মূল্যহীন নয়। আমি পাঠকের প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল।

এই ধরনের একটি বই লেখার ভাবনা অনেকদিন ধরেই একটু একটু করে মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল। চোখে পড়ছিল একাধিক পুরাণ ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। সেগুলি পড়তে পড়তে যখন মনের তার বাঁধা শুরু হচ্ছে, তখন আমার সেই সুরসাধনার সঙ্গে যুক্ত হল আমার ঘুরে বেড়ানো। সময় সুযোগ মতো এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম বাংলার নানা অখ্যাত মন্দিরের ঠিকঠিকানা। অচেনা অজানা দেবদেবীদের আঞ্চলিক থান কিংবা বেদি। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে ভরে নিয়েছিলাম কাঁধে রাখা ঝোলাব্যাগে। তারপর সেইসব ছিন্নপত্রের সমাহারে একটু একটু গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছি বাঙালিদের ধর্মীয় সংস্কৃতিচর্চার একটা সংহত ছবির আর্কাইভ। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমার প্রিয়জনদের অদম্য উৎসাহ ও কৌতুহল। সবচাইতে বেশি সাহায্য পেয়েছি জীবনসঙ্গিনী চৈতির কাছ থেকে। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা দিন লেখাপড়া নিয়ে ডুবে থাকার স্বাধীনতা সবচাইতে বেশি পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা হল পুজো আর্চার নিয়মকানুন, ব্রতষষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডিত্য আমায় অভিভূত করেছে। আমার এ গ্রন্থ প্রণয়নের তাগিদ না এলে তাঁর সে প্রতিভা চিরদিন আলোর আড়ালে থেকে যেত। ঋণগ্রহণের কারণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর এই বিপুল সাহায্যকে ছোটো করতে চাই না। বরং এ গ্রন্থ প্রণয়নের সহযোদ্ধা হিসেবে তাঁকে সারাজীবন এভাবেই পাশে পেতে চাই।

প্রতিটি অধ্যায় বারবার শুনতে চেয়ে আমার অনুশীলনকে যারা ধারালো করে তোলার সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে তারা আমার দুই কন্যা মিত্রবিন্দা ও ঐশীপ্রমা। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে বাড়িতে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি তাদের

পড়াশোনা ও পুরাণ বিষয়ে জানার জগৎটা নেহাৎ ছোটো নয়। যখন তাদের কোনো একজন দেবতা বা দেবীর উদ্ভব পড়ে শুনিয়েছি তখন অনেক টুকরো টুকরো পুরাণের গল্প তারা মনে করিয়ে দিয়েছে, যা কিনা অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছিল আমার লেখায়। রঙ্‌দোল প্রসঙ্গে জালিকা রাক্ষসীর গল্প, শিবের মূর্তি পুজো না হওয়া প্রসঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে ওরাই আমাকে তথ্য দিয়েছে পৌরাণিক অভিধান ঘেঁটে। তাই এ গ্রন্থ প্রণয়নের কৃতিত্ব আমায় ভাগ করে নিতে হবে মিত্রবিন্দা ও ঐশীপ্রমার সঙ্গে।

আমি যে কলেজে পড়াই সেখানে অর্থাৎ কালিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুদের সহযোগিতা ও উৎসাহ আমার দীর্ঘপ্রশ্বাসে সঞ্চিত করেছে দুর্লভ আত্মবিশ্বাস। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবাশিস নন্দী বারবার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছেন যাতে আমার অনুশীলনে এতটুকু ঘাটতি না থেকে যায়। বাণিজ্য বিভাগের দুজন অধ্যাপক শ্রী ইসলাম উদ্দিন খান এবং শ্রী মনীশ বৈদ্য শুধু যে উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার নানা আঞ্চলিক উৎসব নিয়ে অনেক তথ্যের জোগান দিয়েছেন তাঁরা। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক চন্দন রায় পুরাণের ব্যাপারে অনেকটাই পড়াশোনা করা মানুষ। ফলে তাঁর কাছ থেকে পুরাণের নানা তথ্য পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি বারবার। পাণ্ডুলিপি শুনতে শুনতে অনেক জায়গায় ভুলত্রুটিও শুধরে দিয়েছেন তিনি। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বিপুল মন্ডল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পবিত্র কুমার বর্মন ও অনিল রজক, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শুভঙ্কর চৌধুরি, হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ধনঞ্জয় সাহ, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. সন্ত চক্রবর্তী, এঁরা প্রত্যেকেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। আমার কৃতজ্ঞতা অংশকালীন অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার ঝাঁ, পৌলোমী মুখার্জী, অরূপ কুমার দাস এবং দেবসুজন মুখার্জীর প্রতিও। তবে যাঁর সহযোগিতায় কর্মজীবনের অবকাশকে লেখার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছি তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ ড. পীযূষ কুমার দাশ মশাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে।

নানা সময়ে নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে 'পুনশ্চ' প্রকাশনার পুরোধা শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়েক মশাই-এর কাছে এমন একটি বই লেখার পরিকল্পনার কথা যখন জানাই তখন তিনি সোৎসাহে আমাকে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। পন্ডিত-প্রবর এই মানুষটির শিক্ষা, অভিজ্ঞতা আর সংস্কৃতি মনস্কতা বরাবরই আমায় মুগ্ধ করে এসেছে। এমন একজন মানুষের কাছ থেকে উৎসাহ পাবার পর আমি আর পিছন ফিরে তাকাতে চাইনি। পুনশ্চের বর্তমান কর্ণধার সন্দীপ নায়েক ও সপ্তর্ষি নায়েক মশাইও এ বিষয়ে উৎসাহ এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে। তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। সবশেষে বলব, যেহেতু পাঠকের সঙ্গে সরাসরি

মৌখিক যোগাযোগের কল্পনা থেকে এ বই এর প্রথম লাইনটি শুরু করা, এগিয়ে চলা শেষ পর্যন্ত, তাই তাঁদের সম্বোধন করেই ধন্য হওয়ার সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছি আমি। আপনি এবং আমির সেতু ক্রমশ ছোটো হয়ে আসবে এই আশা রেখে সর্বস্তরের সাধারণের মানুষের কাছে 'বাংলার দেবদেবী ও পূজাপার্বণ : পৌরাণিক উৎস ও লোকভাবনা' নিবেদন করছি। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, নির্বিকল্পভাবে আপনারাই এ গ্রন্থের ভাগ্যবিধাতা। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণপ্রমাদ ও তথ্যগত অপূর্ণতা-দোষ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। বইটির ভালোমন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম তাঁদের উপরে, যাঁরা প্রকৃত অর্থে আমার পরমপূজনীয় দেবদেবীকুল। তাঁরা আপনারা, আমার প্রিয় পাঠক।

নমস্কার।

বিনীত—

দেবাশিস ভৌমিক
বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কালিয়াগঞ্জ কলেজ

তনিকা
কৃষ্ণনগর, নদিয়া

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি ১৯-২২২

● গণেশ পূজা : নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ২১

● অতি বিচিত্র গণেশ জন্মকথা ● নবপত্রিকা বা কলাগাছ গণেশের বউ নয় ● ইঁদুর কেন গণেশ বাহন ● লুপ্তপ্রায় গণেশপান্ডিত্য ● কেন নাম গণেশ ● গণেশের চেহারা নিয়ে ● গণেশ লক্ষ্মী ভাইবোন নয় ● ধ্যান-প্রার্থনা ও প্রণামে গণেশ

● সরস্বতী পূজা : জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো ৩৩

● শাস্ত্র ও পুরাণে সরস্বতী ● সরস্বতীর ষোলোটি রূপ বা নাম ● সরস্বতীকে নিয়ে লৌকিক গালগল্প ● হাঁস কেন দেবীর বাহন ● শ্রীপঞ্চমী তিথি ও শীতল খাবার প্রথা ● ধ্যান-স্তোত্র ও প্রণামে সরস্বতী

● দুর্গা পূজা : আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ৪৪

● কে এই দুর্গা : শাস্ত্র ও পুরাণ কী বলছে ● দুর্গার কত অসংখ্য নাম ● সিংহ কেন দুর্গার বাহন ● দুর্গার (সতীর) ৫১টি পীঠস্থান কোথায় কোথায় ● লোক ভাবনায় এই দুর্গা আসলে কে : ইতিহাসই বা কী বলে ● দুর্গা নামের পরিচিত বেষ্টনী থেকেই বাঙালি বাড়িতে নামকরণ ● নবপত্রিকা বা কলাবউ আসলে কী ● উমা আমাদের ঘরের মেয়ে

● লক্ষ্মী পূজা : লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবিরে ঠাঁই ৬০

● শাস্ত্র ও পুরাণে লক্ষ্মীর কথা ● নানা নামে লক্ষ্মী ● লক্ষ্মীপূজা নিয়ে নানা বিচিত্র ভাবনা ● ভিন্‌দেশে লক্ষ্মীপুজো ● পেঁচা কেন লক্ষ্মীর বাহন ● অলক্ষ্মী পুজোর অলক্ষ্মী কে ● কোজাগরী মানে কী ● লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র

● কালী পূজা : অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ৭০

● শাস্ত্র ও পুরাণের সূত্র ● কালীমূর্তি ও কালীপূজা সম্পর্কে লৌকিক ভাবনা ● চৌদ্দশাক, দীপাবলি, বাজিপটকা : বিশেষ তাৎপর্য ● তন্ত্র সাধনায় ও সাহিত্যে কালী

● শিব পূজা : নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা ৭৯

● শাস্ত্র ও পুরাণে শিবের প্রসঙ্গ ● শিবের জটায় গঙ্গা কেন ● অর্ধনারীশ্বর কী ● এক শিব-এর কত নাম ● শিবলিঙ্গ কী ● শিবের ধ্যানমন্ত্র

● বিশ্বকর্মা পূজা : বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো ১০৩

● পৌরাণিক উৎসের সন্ধানে ● বিশ্বকর্মার বাহন কেন হাতি ● লোকভাবনায় বিশ্বকর্মা ● বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রান্নাপুজো ও ঘুড়ি ওড়ানোর চল ● বিশ্বকর্মার ধ্যানমন্ত্র

● জগদ্ধাত্রী পূজা : জননীর দ্বারে আজি ঐ শুনগো শঙ্খ বাজে ১১৩
● পুরাণের কথা ● নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্ভাবক ● জগদ্ধাত্রী পুজোর ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র
● কার্তিক পূজা : তুমি সুন্দর, যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি ১১৯
● শাস্ত্র ও পুরাণে কার্তিক ● কার্তিকের বাহন ময়ূর কেন ● কার্তিক পুজোর পুরোনো চালচিত্র ● কার্তিক পুজোর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র
● অন্নপূর্ণা পূজা : আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে ১২৮
● শাস্ত্র ও পুরাণে অন্নপূর্ণা ● ভিন্‌দেশে অন্নপূর্ণার ধারণা ● অন্নপূর্ণার ধ্যান মন্ত্র ও স্তোত্র
● মনসা পূজা : অন্ধজনে দেহো আলো মৃতজনে দেহো প্রাণ ১৩২
● শাস্ত্র ও পুরাণে মনসা ● বাংলা সাহিত্যে মনসাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য ● লোক ভাবনায় মনসা ● মনসাপুজোর ধ্যান ও মন্ত্র
● শীতলা পুজো : আমি তারেই জানি যে জন আমায় আপন জানে ১৪৩
● শাস্ত্র ও পুরাণে শীতলা ● গ্রামবাংলায় লোকদেবী শীতলা
● শনি পূজা : তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন ১৪৮
● শাস্ত্র ও পুরাণে শনিদেব ● বারের ঠাকুরের প্রণাম-ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র
● ষষ্ঠী পূজা : তুমি আরো আরো আরো করো দান ১৫৩
● পুরাণে ষষ্ঠীর কথা ● ষষ্ঠীর বাহন বেড়াল কেন ● ষষ্ঠীপুজোর ধারনধারণ ● লোকজীবনে ষষ্ঠী দেবী
● সত্যনারায়ণ পূজা : আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ১৬০
● শাস্ত্র ও পুরাণে নারায়ণ ● নারায়ণের নানা নাম ● শালগ্রাম শিলা কী ● সত্যনারায়ণ পূজার নিয়ম কানুন
● গঙ্গা পূজা : নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে ১৭২
● পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ক ছ'টি গল্প ● শাস্ত্র ও সাহিত্যে গঙ্গানাম ● গঙ্গাপুজোর ধ্যান—প্রণাম মন্ত্র ও স্তোত্র
● ব্রহ্মা পূজা : আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার ১৮৬
● শাস্ত্র ও পুরাণে ব্রহ্মা ● ব্রহ্মার বিবাহবিভ্রাট ● ব্রহ্মাপত্নী গায়ত্রী থেকে গায়ত্রী মন্ত্র ● পশ্চিমবাংলায় ব্রহ্মাপুজো ● ব্রহ্মাপূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র
● বাস্তু পূজা : তুমি যে এসেছ মোর ভবনে, রব উঠেছে ভুবনে ১৯৬
● বাস্তুপুজোর রকমসকম ● বাস্তুপুজোর কুমির ● বাস্তুপুজোর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র
● কৃষ্ণ পূজা : যত তোমায় ডাকি, আমার আপন হৃদয় জাগে ২০১
● কৃষ্ণ থেকে গোপাল : পথের পাঁচালি ● কৃষ্ণের প্রেম ও বিবাহ ● অচিন্ত্য

ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রসঙ্গ • গোপাল বা কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম • কৃষ্ণ কি কোনোদিন বাস্তবে ছিলেন • স্তোত্র প্রণামে গোপাল ও কৃষ্ণ

• গন্ধেশ্বরী পূজা : ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়, তবু জান মন তোমারে চায় ২১৯

বাংলা সাহিত্যে গন্ধেশ্বরী পুজো প্রসঙ্গ • গন্ধেশ্বরী পূজার নিয়মকানুন

দ্বিতীয় অধ্যায় : পূজা ভ্রমণ (প্রথম পর্ব) ২২৩-২৫০

• ফিরায়ে দিনু ঘরের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি ২২৫

• লুপ্তপ্রায় দেবদেবী : পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় ২৩১

সিদ্ধেশ্বরী (উগ্রচণ্ডী) কালীপূজা, জলকর মথুরাপুরের মনসা পূজা, জগদানন্দপুরের কালীপূজা, বিল্বগ্রামের মদনমোহন পূজা, মথুরাগাছির খেদাইঠাকুর পূজা, মশুন্ডার মশানচণ্ডীর পূজা, বৈরামপুরের কৃষ্ণবলরাম পুজো, সংগ্রামপুরের রাজকৃষ্ণের কালীবাড়ি, উলাইচণ্ডীর পূজা, চাকলার ডাকাতে কালী, জামালপুরের বুড়োশিবের মন্দির, শ্বেতপুরের মৃন্ময়ীকালী, চিন্তামণি মনসা, ভূতপুজো, গুহ্যকালী পুজো, বুড়িমা পুজো, ব্রহ্মদৈত্য পুজো, মহাদানার থান, কালীপুর গ্রামের মনসা, একচক্রাপুরের জগন্নাথ, কল্যাণেশ্বরী, ঘাগরবুড়ি, শ্যামারূপা, বাশুলি, ওলাইচণ্ডী, জামলালা, ভিরকুনাথ, লাউকুড়ি ও বনপাহাড়ি, ভাঙানালা, বাথান ডাইন, ঘটামূল, দারিদ্র্যনাশিনী, রাজবল্লভী, শিবনিবাসের শিব, নৃসিংহ দেব।

পূজা ভ্রমণ (দ্বিতীয় পর্ব) ২৫১-২৬৬

• আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ ২৫৩

তৃতীয় অধ্যায় : ব্রতষষ্ঠী ২৬৭-৩৪৪

• দগ্ধপ্রদীপের স্বর্ণলেখা ২৬৯

• ব্রত ২৭৪

বিপত্তারিণী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, যমপুকুর ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, হরিচরণ ব্রত, সুবচনী ব্রত, দশপুতুল ব্রত, পৌষসংক্রান্তির ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, শীতলা ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, নিত্সিঁদুর ব্রত, আদাহলুদ ব্রত, রূপহলুদ ব্রত,আদরসিংহাসন ব্রত, কলাছড়া ব্রত, জলসংক্রান্তির ব্রত, পৃথিবী ব্রত, ফলগছানো ব্রত, গুপ্তধন ব্রত, শিব ব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত, গোকাল ব্রত, সন্ধ্যামণি ব্রত, চম্পক ব্রত, ধানগছানো ব্রত, ঘৃতসংক্রান্তি ব্রত, ছাতুসংক্রান্তি ব্রত,দর্পণসংক্রান্তি ব্রত, তেজদর্পণ ব্রত, যাচাপান ব্রত, মিষ্টি পূর্ণিমা ব্রত, পদ্ম পূর্ণিমা ব্রত, সীতানবমী ব্রত, নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, ফল পূর্ণিমা ব্রত, অন্নসংক্রান্তি ব্রত, বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রত, সুবচনী ব্রত, পিপীতকী-দ্বাদশী ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, নির্জলা একাদশী ব্রত, চাঁপা চন্দন ব্রত, জ্যৈষ্ঠচম্পক ব্রত, মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত, অঘোর চতুর্দশী ব্রত, অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত, দূর্বাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, হরিতালিকা ব্রত, অনন্ত চতুর্দশী ব্রত,সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত, জিতাষ্টমী ব্রত, বীরাষ্টমী ব্রত, কার্তিক ব্রত, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ব্রত, বকপঞ্চক ব্রত, ক্ষেত্র ব্রত, কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, সংকট মঙ্গলবারের ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত, রালদুর্গা ব্রত, ইতুপুজোর ব্রত, তুষ-তুষলি ব্রত, সুয়োদুয়োর ব্রত, ভীম একাদশী ব্রত, শিবরাত্রির ব্রত, রামনবমী ব্রত, ষোলোকলা ব্রত, অক্ষয়ঘট ব্রত, অক্ষয় সিঁদুর ব্রত, অক্ষয়কুমারী ব্রত, অক্ষয়ফল

ব্রত, বারোমেসে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, মঙ্গল সংক্রান্তি ব্রত, এয়ো সংক্রান্তি ব্রত, নিত্য সিঁদুর ব্রত, নখ ছুটের ব্রত, মধুসংক্রান্তি ব্রত, সন্তোষী মা'র ব্রত।

● ব্রত কথা : পুনশ্চ ৩৩১

●অরণ্যষষ্ঠী, লোটনষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, দুর্গাষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী, শীতলষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, নীলষষ্ঠী।

● ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর, ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী। ৩৪০

চতুর্থ অধ্যায় : পালা পার্বণ : আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো ৩৪৫-৪১৬

● হালখাতা বাংলা নববর্ষ সিদ্ধিলাভ : বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কীসের হর্ষ ● জামাইষষ্ঠী : আইলাম গো অরণে, মা ষষ্ঠীর বরণে ● রথযাত্রা : যাও প্রিয়, যাও তুমি, যাও জয় রথে ● ঝুলনযাত্রা ও রাখিবন্ধন : আমার খেলা যখন ছিল তোমার মনে ● অম্বুবাচী : গভীর সুরে চাই নে চাই নে বাজে অবিশ্রাম ● রংদোল : চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিও ক্ষমা ● অক্ষয়তৃতীয়া : প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়করুণা ধন ● দশহরা ও মকরস্নান : রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি ● মহালয়া ও তর্পণ : অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে ● দেওয়ালি : আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও ● জন্মাষ্টমী : ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু ● ভাইফোঁটা : চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস নে আর মায়াডোরে ● পৌষপার্বণ : এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে ● চড়কগাজন : আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়, আয়, আয়

পঞ্চম অধ্যায় : এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে ৪১৭-৪৩৮

● হুদুমদেও : পরাও পরাও জ্যোতির টিকা, করো হে আমার লজ্জাহরণ ● গম্ভীরা : প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে ● ভাদু : দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে ● টুসু পরব : তোরা শুনিসনি কি, শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি ● ইঁদপার্বণ : এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর ● ধর্মপুজো : আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে ● রাস উৎসব : সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ● বারোদোল : অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে ● ছট পরব : শিশির শিহর শরতপ্রাতে, শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে

শেষ কথা : শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ৪৩৯-৪৪৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪৪৪-৪৪৮

প্রথম অধ্যায়

॥ তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি ॥

জীবনের সুধারস কার কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে। আপনজনের পরিচিত বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বুকের গভীর তলদেশে কোথায় যেন বেজে ওঠে বেদনার নির্জন রাগিণী। তোমাকে চাই। শুধু তোমাকে চাই, অন্তর্লীন এই ধ্বনিগুচ্ছ রণিত হতে থাকে আমার আপনার সকলেরই অপূর্ণ অনুভবে। কীসের অপূর্ণতা, কীসের অপ্রাপ্তি কেই বা জানে। অজ্ঞানতার অন্ধকার যত গাঢ় হয় জীবনজুড়ে ততই দূর আকাশপথের নক্ষত্রলোক আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যা ছিল প্রেম তা যে কখন পূজা হয়ে যায়, নতজানু শ্রদ্ধার পাত্র কখন যে ভরে ওঠে প্রণতির সুগন্ধি পুষ্পে, আমরা জানতেও পারি না। যখন জানি, যখন বুঝি, তখন আমার শ্রদ্ধা আর প্রণামের অর্ঘ্য সেজে ওঠে অপরিসীম আন্তরিকতায়। তোমায় ভালোবাসি, এই চিরন্তন বাণী ইথারিত হতে থাকে নভোমন্ডলে। ভালোবাসার ভিন্ন অর্থ পূজা, এই অকপট শব্দটি জীবনের প্রাণবায়ুকে পাথেয় করে শুরু করে তার পথচলা। আমাদের চলার পথে একের পর এক আমরা পেরিয়ে যাই আমাদের ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ। আমাদের পূজার মন্দির। আমাদের প্রণত যাত্রাপথের পাঁচালি।

॥ গণেশ পূজা ॥

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে

১লা বৈশাখ মানেই বাঙালি বাড়িতে সকাল সকাল স্নানটি সেরে ফেলা। কচি আম আর আমপাতার শিকল বানানো। পাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ মন্ত্রোচ্চারণ। আর দুপুরের পাতে নিরামিষ খাবারের রকমারি বাহার, শেষপাতে টক দই। কচি আমের অম্বল একেবারে জমিয়ে দেয় দুপুরের খাওয়াটি। সোনামুগ ডালে টক আমের গন্ধ মিশে সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেয় রসনায়। কুচো বড়ি ভাজা, ছানার ডালনা—কী থাকে না ১লা বৈশাখের দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য তালিকায়। গ্রীষ্মের দুপুরে, কখনো বা লোডশেডিং-এর দুপুরে হাতপাখা চলতে থাকে অবিরাম আর তার সঙ্গে চলে পরিবারের নানা গল্পগাছা। দামি জামা কাপড় কেনা হয়তো হয় না এই পয়লা বৈশাখে, কিন্তু নিদেনপক্ষে একটা গামছাও নতুন আসে ওই বিশেষ দিনটিতে। নববস্ত্র পরবার রেওয়াজ আজও কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছে বাঙালি। বাড়ির মেয়ে বউদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হলে কপালে জোটে একখানা আটপৌরে শাড়ি কিংবা ঘরে পরার অতি সাধারণ পরিধেয়। আর এটুকুতেই সানন্দে থেকে এসেছে চিরকাল তারা। আজ কোনো কিছুতেই দুঃখ পাবার দিন নয়। আজ

পয়লা বৈশাখ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে না নামতেই ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা জামাকাপড় বেরোয় আলমারির গোপন কোনো ভাঁজ থেকে। তারপর আদ্যন্ত বাঙালি সাজে বেরিয়ে পড়তে হয় হালখাতা করবার জন্যে দোকানে দোকানে। আর এই হালখাতার সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে গণেশপুজোর প্রসঙ্গ। বাঙালির পুজোআর্চার তালিকায় প্রথম যিনি স্থান দখল করে রেখেছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং গণপতি মহারাজ।

বাঙালিদের যে কোনো শুভকাজের শুরুতেই এই গণেশ দেবতার পুজো করতে হয়। কেন হয়, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা বাংলা বছরের এই প্রথম দিনটিতে গণেশের পুজো করবেনই। অবশ্য মহারাষ্ট্র বা সন্নিকটবর্তী দু'একটি জায়গায় ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশ পুজোর চল রয়েছে। একে গণেশ চতুর্থী বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে পশ্চিবাংলাতেও গণেশ চতুর্থীর প্রচলন লক্ষ করা যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখ ছাড়াও গণেশের পুজো প্রচলিত রয়েছে অক্ষয় তৃতীয়াতেও। ব্যবসায়ীরা এটা করে থাকেন। পয়লা বৈশাখ ছাড়াও অন্যদিনে গণেশপুজো হয় মুর্শিদাবাদের বালানগর গ্রামে। এই পুজোটি হয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। রাস উৎসবেব সময় নবদ্বীপে নৃত্যরত গণেশ মূর্তি পূজার প্রচলন রয়েছে। যাঁরা পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা সমীক্ষা করে দেখেছেন আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত গণেশের একক পূজার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ সঙ্গে দুর্গা কিংবা লক্ষ্মীসহ গণেশপূজার কথা জানা যায় না। গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে নানা সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল সে সময়ে। তাদের নামগুলিও বড়ো অদ্ভুত—মহাসম্প্রদায়, হরিদ্রা সম্প্রদায়, উচ্ছিষ্ট সম্প্রদায়, স্বর্ণ সম্প্রদায় এবং সন্তান সম্প্রদায়। এই পাঁচটি সম্প্রদায়কে একসঙ্গে বলা হোত গাণপত্য সম্প্রদায়। তবে এখন আর এ সব সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই নেই।

অতিবিচিত্র গণেশ জন্মকথা

গণেশের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে অসংখ্য ও বিচিত্র সব গল্প প্রচলিত রয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে যুক্তি খুঁজে দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল বিচিত্র সেই সব কাহিনির অভূতপূর্ব রস আস্বাদন করেই তৃপ্তি পেতে চাই। একটি একটি করে গল্পের কথা বলা যাক। প্রথমেই আসছি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রসঙ্গে। সেখানে বলা হচ্ছে, সম্প্রতি শিবের সঙ্গে পার্বতীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে গেল। সুখে স্বাচ্ছন্দে দিনযাপন করছেন তাঁরা। দিন গড়াল, মাস গড়াল, বছর গড়াল। পার্বতীর মনের কোণে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা দানা বাঁধতে লাগল। এতদিন হয়ে গেল, অথচ আজও তিনি সন্তানের মুখ দেখতে পেলেন না। তাঁর কতদিনের আশা, তিনি একটি অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রসন্তানের জননী হবেন। ধ্যানযোগে মহাদেব জানতে পারলেন পার্বতীর এই গোপন ইচ্ছার কথা। তিনি পার্বতীকে বললেন—দেবী, তুমি এক কাজ করো। পুত্রার্থে

তুমি একটি ব্রত উদ্‌যাপন করো। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তুমি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারবে। পতিদেবতার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে পার্বতী বিরাট ধুমধাম করে ব্রত অনুষ্ঠান শুরু করলেন। অনুষ্ঠানে পুরোহিত হিসেবে এলেন সনৎকুমার। প্রথা আচার মেনে অবশেষে ব্রত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কিন্তু কই, সন্তান সম্ভাবনার কোনো আশাই তো পার্বতীর চোখে পড়ছে না। তবে কি স্বামীর ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণিত হবে। দ্বিধায় পড়লেন পার্বতী। এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন পার্বতীর কানে এল এক দৈববাণী—হে কল্যাণী, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। খুব তাড়াতাড়িই তুমি বিষ্ণুর মতো মহাবলী এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রের জননী হবে। পার্বতীর মনের মধ্যে আবার আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল। দিন যায়, মাস যায়, একটু একটু করে পার্বতী অনুভব করতে থাকেন যে তিনি এবার সত্যি সত্যিই মা হতে চলেছেন।

দৈববাণীর এক বছরের মধ্যে সন্তানের মুখ দেখলেন পার্বতী। রূপবান, তেজস্বী এক শিশুপুত্রের মুখ দেখে আহ্লাদে ভরে গেল মায়ের বুক। স্বর্গের দেবতারা একে একে সবাই এলেন ছেলে দেখতে। শিবের পুত্র বলে কথা। দেবতাদের মধ্যে ছিলেন গ্রহরাজ শনিও। সব দেবতা পার্বতীর কোলে শিশুপুত্রকে দেখলেও শনি কিন্তু কিছুতেই সে ঘরে ঢুকতে রাজি হলেন না। পার্বতী বারবার গ্রহরাজকে অনুরোধ জানালেন ভেতরে আসবার জন্য। কিন্তু শনি নাছোড়। তিনি কিছুতেই ঢুকবেন না। খুব দুঃখ পেলেন পার্বতী। জানতে চাইলেন শনির কাছে তাঁর এই একগুঁয়েমির কারণ কী। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শনি তখন বেদনাঘন গোপন একটি কাহিনি নিবেদন করলেন পার্বতীর কাছে। সে কাহিনি সত্যিই বড়ো দুঃখজনক। গ্রহরাজ শনি সদাসর্বদা বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। স্ত্রীর কামনা-বাসনা কিংবা প্রত্যাশা পূরণে কোনোদিনই আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। এই উপেক্ষা সইতে সইতে একদিন শনির স্ত্রী সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে স্বামীকে অভিশাপ দিলেন—'স্বামিন্, আমায় উপেক্ষা ও অবহেলা করেছেন যে দৃষ্টি দিয়ে, আপনার সে দৃষ্টি হবে বিনাশকারী। আপনি যার দিকে তাকাবেন সেই দগ্ধ হবে এবং ভস্মে পরিণত হবে'। আতঙ্কিত শনি তাই পার্বতীপুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চান না। এবং সে জন্যেই তিনি ঘরে ঢুকতে চাইছেন না। কিন্তু পুত্রসন্তান লাভ করার আনন্দে পার্বতী যুক্তিবুদ্ধি রহিত হয়ে পড়েছিলেন। সব জানার পরও তিনি গ্রহরাজকে ঘরে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অগত্যা নিরুপায় গ্রহরাজ ঘরে ঢুকলেন এবং নব জাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল মহা অনর্থ। মুহূর্তের মধ্যে নবজাতকের মুখমন্ডল জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। নিমেষের মধ্যে ভস্মে মিলিয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দর সে নবজাতকের মুখ। পুত্রের এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়লেন জননী পার্বতী। তারপর শুরু হল তাঁর আকুল বিলাপ। মায়ের সেই আকুতিতে শেষপর্যন্ত টলে উঠল বিষ্ণুর হৃদয়। বিচলিত হলেন বিষ্ণু। সেই সময় গরুড়পাখির পিঠে চড়ে তিনি

আকাশপথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল পুষ্পাভদ্রা নদীর তীরে বিশাল এক হাতি শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে দিলেন নিজের সুদর্শন চক্রটি। হাতির মাথা এবং শরীর বিচ্ছিন্ন হল সেই চক্রের আঘাতে। হাতির মাথাটি নিয়ে এসে তিনি পার্বতীর হাতে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন সেটিকে মুন্ডহীন শিশুপুত্রের গলায় বসিয়ে দিতে। বিষ্ণুর কথা শুনে পার্বতী তাই করলেন। গজমুখের জন্য শিশুপুত্রটি পরিচিত হলেন গজানন নামে। এই গল্পটি প্রায় সবাই জানেন। তাই আর-একটি গল্পের কথা বলি।

এ গল্পটিও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই রয়েছে। একসময় কৈলাসে মালি আর সুমালি নামে দুজন শিবভক্ত ছিলেন। এমনিতে তারা তেমন একটা নির্বুদ্ধিতা না করলেও হঠাৎ একদিন অনর্থ করে ফেললেন। হাতে থাকা ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করে বসলেন সূর্যকে। এই আঘাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সূর্য। আর সূর্য অচৈতন্য হয়ে পড়লে যা হবার তাই হল। সারা পৃথিবী ঢেকে গেল অন্ধকারে। সূর্যের পিতার নাম কশ্যপ। পুত্রের এই আকস্মিক পরিণতি দেখে পিতা কশ্যপ ক্রোধে আগুন হয়ে গেলেন। মালি সুমালিকে না চিনলেও কশ্যপ জানতেন যে এরা মহাদেবেরই সাঙ্গপাঙ্গ। তাই সরাসরি তিনি মহাদেবের কাছে ছুটে গেলেন এবং তর্জনী তুলে অভিশাপ দিলেন—তোমার দুই ভক্তের ত্রিশূলের আঘাতে আমার পুত্র সংজ্ঞাহীন। তাই আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, তুমিও একদিন পুত্রসন্তানের পিতা হবে। কিন্তু জন্মের পরই সেই পুত্রের মস্তক হবে স্থানচ্যুত। অভিশাপ শুনে শিউরে উঠলেন মহাদেব। কিন্তু তখন আর কিছুই করবার নেই। ভবিষ্যৎ ঘটনা চোখের সামনে দেখেও ধ্যানমগ্ন মহাদেবের নিঃসহায় অবস্থার কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। অভিশাপ সত্যি হল কিছুদিনের মধ্যেই। অভিশাপের কথাটা মহাদেবের আগেভাগেই জানা ছিল। তাই পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হবার পরই হাতির মাথা জোগাড় করে আনতে তাঁকে খুব বেশি সময় নিতে হয়নি। তাঁর এনে দেওয়া গজমুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল গণেশের গলায়। তবে এখানে যে হাতির মাথাটি উল্লেখিত হয়েছে তার নাম ছিল ঐরাবত।

তবে পুরাণের গল্প তো। এতে অলৌকিকতার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পুরাণের আর-একটা গল্পে গণেশের জন্ম নিয়ে ভিন্ন কাহিনি আছে। একবার নাকি ঐরাবত হাতির বেশ ধরে মহাদেব এবং পার্বতী অরণ্যে বিহার করছিলেন। সেই সময় তাঁদের পারস্পরিক মিলন হয় এবং গজমুখ বিশিষ্ট গণেশের জন্ম হয়। আরও মজার গল্প আছে স্কন্ধপুরাণে। সেখানে গণেশখন্ড বলে একটি অধ্যায় আছে। তাতে এক বিচিত্র গল্প আছে। সিন্দুর নামে একজন দৈত্য ছিল। সে নাকি দৈবের বলে দেবী পার্বতীর গর্ভের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পার্বতীর গর্ভে থাকা পুত্রটির মস্তক ছিন্ন করে। গণেশের জন্ম নাকি হয়েছিল মুন্ডহীন অবস্থাতেই। কিন্তু জন্মের পর পরই গণেশ স্বতেজ বলে গজাসুর-এর মস্তক কেটে আনে এবং নিজের স্কন্ধের ওপর বসিয়ে দেয়। তবে বামন পুরাণে গণেশের জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে যে সব কথা আছে তা কতকটা স্বাভাবিক। যেমন

সেখানে বলা হচ্ছে, একবার শৈলসুতা শঙ্কর-হৃদয়বিলাসিনী উমা নাকি নিজের দিব্য বপু বা শরীর থেকে সর্বসুলক্ষণযুক্ত, চতুর্ভুজ, গজানন পুত্রের সৃষ্টি করেন। কালক্রমে তিনি গণেশ নামে পরিচিত হন। এই গণেশ পার্বতীর গর্ভজাত নন। ইনি নায়ক বা জনক ব্যতীত আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই গণেশের আর-এক নাম বিনায়ক।

বরাহপুরাণ বলছে, গজানন গণেশ আদৌ অযোনিসম্ভব। মহাদেবের শ্রীমুখ থেকে গণেশের জন্ম। আবার শিবপুরাণের রুদ্রসংহিতায় দেওয়া আছে, পার্বতীর গাত্রমল থেকে গণেশের উৎপত্তি। পার্বতীর গাত্রমল দিয়ে শরীর তৈরি হলেও তার মাথার অংশটি অবর্তমান দেখে মহাদেব একটি গজমুখ এনে সেখানে বসিয়ে দেন। এভাবেই গণেশের বহিরাবয়ব তৈরি হয়। অবশেষে মহাদেবের করুণায় গণেশ জীবন্ত হয়ে ওঠেন। ভক্তিভরে জননী পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করেন। পিতামাতার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন গণেশ। তাঁদের বরেই তিনি হল গণাধিপতি। তাঁর প্রসিদ্ধি ঘটে বিঘ্ন বিনাশক ও সর্বসিদ্ধিদাতা রূপে। দেবীপুরাণ গ্রন্থে আবার গণেশের জন্মের পিছনে পার্বতীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেখানে বলা হচ্ছে, স্বয়ং মহাদেবই নাকি গণেশের জন্ম দিয়েছেন এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে। শিব নাকি নিজের পাণিতল মন্থন করে অর্থাৎ হাতে হাত ঘসে ঘসে জাদুকরের মতো হঠাৎ করেই গণেশের আবির্ভাব ঘটিয়ে দেবতাদের হতচকিত করে দেন। তবে এই গল্পটা খুব বড়ো নয়। বরং মৎস্যপুরাণে গণেশের জন্ম নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। শিবপত্নী উমা একবার সখীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে কৌতুকের বশে গাত্রমার্জন চূর্ণক (সাবান টাবান জাতীয় কিছু হবে হয়তো) থেকে গজমুখধারী একটি পুতুল বানান। অনেকক্ষণ সেই পুতুলটিকে নিয়ে খেলা করবার পর সখীরা পার্বতীর বানানো সেই পুতুলটিকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন। আর তখনই সবাইকে চমকে দেবার মতো এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পুতুলটি জলের উপর ভেসে ওঠে। ক্রমশ তা বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে এবং সমস্ত পৃথিবী ঢেকে ফেলতে উদ্যত হয়। দেবী পার্বতী সেই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দিব্যরূপধারী সেই মহাত্মাকে তিনি নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। যেহেতু গঙ্গার জলে সেই বিশালাকায় মূর্তিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল তাই দেবী গঙ্গাও তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেন। সেইজন্য গণেশের আর-একটি নাম হল গাঙ্গেয়। পিতামহ ব্রহ্মা এই গাঙ্গেয়কে গণাধিপত্য দান করেছিলেন বলে মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে।

নবপত্রিকা বা কলাগাছ গণেশের বউ নয়

বাঙালিদের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, গণেশের বউ হল কলাগাছ। তাই দুর্গাপুজোর সময় কলাগাছকে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিয়ে গণেশের বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, ঠিক কলাগাছ